দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাণ সাহিত্য

ভূমিকা ঃ ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণগুলি এক অমূল্য সম্পদ। পূর্বে ভারতীয় পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে রূপকথার বেশি মূল্য দিতেন না। কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পার্জিটার (Pargiter) সাহেব ভারতীয় ইতিহাস জানবার পক্ষে পুরাণগুলির অপরিহার্যতার দিকে সর্বপ্রথম আমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুরাণসাহিত্যের আলোচনায় আমাদের পথিকৃৎ উইলসন্ (Wilson) সাহেব পুরাণগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, সেগুলি—"...are only pious frauds written in subservience to sectarian imposture." গোল্ডস্টুকার (Gold-stucker) সাহেবের মতে পুরাণের ধর্ম গ্রহণ করবার ফলেই বর্তমানে হিন্দুধর্মের অত্যন্ত অধঃপতন ঘটেছে এবং পুনরায় বৈদিক ধর্মে ফিরে গেলে তবেই হিন্দুধর্মের সকল ক্লেদ বিদূরিত করা সম্ভব। তিনি বলেছেন—"All barriers to religious imposition having broken down since the modern Puranas were received by the masses as the source of their faith, sects have sprung up which not merely endanger religion, but society itself; tenets have been propounded, which are an insult to the human mind; practices have been introduced, which must fill every true Hindu with confusion and shame." অবশ্য এই মত সর্বাংশে সত্য নয়; কারণ, পুরাণগুলিও বেদমূলক এবং ইংরাজীতে religion বলতে যা বোঝা যায় আমাদের শাস্ত্রের ধর্ম বলতে ঠিক তা বোঝানো হয় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মকেও খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা তো জীবন্ত সমাজেরই লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণন (Dr. Radhakrishnan) বলেছেন—"... a living society must have both the power of continuity and power of change." ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অধ্যাপক হাজরা পুরাণ সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন।

পুরাণ শব্দের অর্থ ঃ 'পুরাণ' শব্দের অর্থ পুরাতন। এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যই অবশ্য পুরাণ-সংজ্ঞা লাভ করেছে। প্রাচীন যুগের নানা কাহিনী এই সাহিত্য সম্ভারের বিষয়বস্তু বলেই এগুলি পুরাণ নামে অভিহিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ ও ইতিহাস প্রায় সমার্থকরূপে প্রযুক্ত হয়েছে দেখা যায়। অবশ্য ইতিহাস বা ইতিহাস-পুরাণ বলতে সে যুগে বিশেষ কোন সাহিত্যকে বোঝানো হত বলে মনে হয় না। অথর্ববেদে অবশ্য যে 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা কোন গ্রন্থবিশেষকে বোঝায় বলে মনে হয়। পুরাণ ও ইতিহাস (ইতি হ আস—পূর্বে এইরূপ ছিল) শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হলেও এদের পার্থক্য সম্পর্কে মোনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব তাঁর *'Hinduism'* গ্রন্থে বলেছেন—"It is true that the latter furnish the raw materials for the composition of the Puranas, but, notwithstanding their relationship, the two classes of works are very different. The Ithihasas are the legendary histories of heroic men before they were actually deified, whereas the Puranas are properly the history of the same heroes converted into positive gods, and made to occupy the highest

position in the Hindu Pantheon." উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে দুটি পৃথক জাতীয় সাহিত্য রূপেই ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে—"পুরাণেষ্বিতিহাসোঽয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ।" পুরাণ ও ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে পার্জিটার সাহেব তাঁর '*Ancient Indian Historical Tradition*' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "Purana means any 'old-tale' or 'ancient lore' generally, and Itihasa would seem properly to denote a story of fact in accordance with its derivation 'iti ha asa' (ইতি-হ-আস), which rather denotes actual traditional history. But the line between fact and fable was hardly definite and gradually became blurred, especially where the historical sense was lacking and so no clear distinction was made, particularly in brahmanic additions to the Puranas. Hence both words tended to become indefinite."

'পুরাণ' শব্দটির অর্থ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে গোল্ডষ্টুকার সাহেব বলেছেন ঃ "The word itself, as designating a class of writings, occurs as early as in the law-books of Manu, though this book itself, as we have seen, may be called recent when compared with the Vedic text. A definition, however, of what such Puranas are does not occur before the beginning of the christian era, when the lexicographer Amarasinha says, that a Purana is a work which has 'five characteristic marks.' This definition is again explained by the commentators on the glossary of Amarasinha ; and the oldest of them did not live earlier than about four hundred years ago."

পুরাণের বিষয়বস্তু ঃ বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পুরাণের বিষয়বস্তুর পাঁচটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।"

অর্থাৎ পুরাণের আলোচ্য হল ঃ (১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়ের ফলে পূর্বসৃষ্টি ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টির বিকাশ), (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা), (৪) মন্বন্ত (মনুগণের শাসনকালের বর্ণনা), এবং (৫) বংশানুচরিত (রাজাদের বংশের ইতিহাস) মৎস্যপুরাণে অবশ্য উক্ত পাঁচটি ছাড়াও আরও ছয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সেগু হল ঃ (১) ভুবনবিস্তর, (২) দানধর্মবিধি, (৩) শ্রাদ্ধকর্ম, (৪) বর্ণাশ্রমবিভাগ, (৫) ইষ্টাপূর্ত (৬) দেবতাপ্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।
দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে ভুবি।
তৎসর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।।"

অবশ্য, উপরে বর্ণিত ১১টি বিষয় ছাড়াও ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, শারীরবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি আরও বহু বিষয় পুরাণে আলোচিত হতে দেখা যায়। পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণ নীতিটি বিষ্ণুপুরাণ সম্পর্কেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযোজ্য বলে মোনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব মনে করেন এবং তাঁর মতে ঐ নীতি প্রায় কোন পুরাণেই অনুসৃত না হওয়ায় মনে হয় যে, ব্যাসদেব তাঁর ছজন শিষ্যকে ছটি সংহিতা শিখিয়েছিলেন বলে ভাগবতপুরাণে যে বর্ণনা আছে সেই সংহিতাসমূহই বর্তমান পুরাণগুলির ভিত্তি। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "In the Bhagavata Purana, six original collections are especially declared to have been taught by Vyasa to six sages, his pupils, and these six collections may have formed the bases of the present works."

উইলসন্ সাহেব বলেছেন যে, কতকগুলি পুরাণ উক্ত পঞ্চলক্ষণ আদৌ অনুসরণ করে নি এবং কতকগুলি আংশিক অনুসরণ করেছে মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে উক্ত পঞ্চলক্ষণ কেবল উপপুরাণগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং মহাপুরাণের লক্ষণ হল দশটি। ভাগবতপুরাণে মহাপুরাণের দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে : সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়। পার্জিটার সাহেবের মতে উক্ত পঞ্চলক্ষণ হল প্রাচীন পুরাণগুলির বৈশিষ্ট্য এবং যে সকল পুরাণ ঐগুলি অনুসরণ করেনি সেগুলি পরবর্তীকালের রচনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "This term could not have been coined after the Puranas substantially took their present composition, comprising great quantities of other matters, especially brahmanic doctrine and ritual, dharma of all kinds and the merits of tirthas, which are often explained with emphatic prominence. It belongs to a time before these matters were incorporated into the Puranas. It is therefore ancient characteristics of the earliest Puranas, and shows what their contents were." তাঁর মতে অবশ্য 'ধর্ম' পুরাণের আলোচ্য নয়। আবার এক এক পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কোন একজন বিশেষ দেবতার উপাসনার কথা বলা হয়েছে এবং তাঁকে অপর দুজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত পঞ্চলক্ষণের মধ্যে বর্তমান পুরাণগুলির এই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যটির কথা বলা হয়নি। এই প্রসঙ্গে পার্জিটার সাহেব বলেছেন ঃ "What is especially significant of almost all our Puranas, their sectarian character, i.e., their being dedicated to the cult of some god or other, of Vishnu or Siva, is completely ignored by the old definition." অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বৈদিক সংহিতায় যেমন বহু দেবতাবাদের অন্তরালে একেশ্বরবাদের কথা ঘোষিত হয়েছে, পুরাণগুলিতেও তেমনই ত্রিমূর্তিবাদের অন্তরালে একেশ্বরবাদ আছে।

কূর্মপুরাণে আছে ঃ "গৃণন্তি সততং বেদা মামেকং পরমেশ্বরম্।।"
বিষ্ণুপুরাণে অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে ঃ

"যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে।
বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্বগতৈকরূপো
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ।।"

এই প্রসঙ্গে মোনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব মন্তব্য করেছেন ঃ "While nominally tritheistic—to suit the three developments of Hinduism, the religion of the Puranas is practically polytheistic and yet essentially pantheistic. Underlying their whole teaching may be discerned the one grand doctrine which is generally found at the root of Hindu Theology, whether Vedic of Puranic—pure uncompromising pantheism."

পুরাণসমূহের বিভাগ, সংখ্যা ও নাম ঃ পুরাণসাহিত্য প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণগুলি সাধারণতঃ উপপুরাণগুলি অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রাধান্যযুক্ত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে উভয় বিভাগের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সৌরপুরাণেও সে কথা বলা হয়েছে। তবে উপপুরাণগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের সহায়ক হিসাবে রচিত বলে মনে হয়। কূর্মপুরাণ ও পরাশর উপপুরাণে বলা হয়েছে যে, ব্যাসদেবের নিকট অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করে উগ্রশ্রবা মুনি উপপুরাণগুলি রচনা করেন। মৎস্যপুরাণের মতে মহাপুরাণ থেকেই উপপুরাণগুলির উৎপত্তি এবং ঐগুলি মহাপুরাণগুলিরই উপভেদমাত্র। সৌরপুরাণের মতে উপপুরাণগুলি মহাপুরাণসমূহের খিল বা পরিশিষ্ট। কোন কোন উপপুরাণ কোন কোন মহাপুরাণের পরিশিষ্ট রূপে রচিত ঠিকই ; তবে অনেকগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে। উপপুরাণগুলি অবশ্য নিজেদের পুরাণ নামেই অভিহিত করেছে এবং কোন মহাপুরাণের সাথে নিজেদের যুক্ত করে প্রসিদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করেনি। ভাগবতপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই সর্বপ্রথম মহাপুরাণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তখন থেকেই ১৮টি পুরাণ মহাপুরাণ নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে। এদের নাম ঃ

(১) মৎস্য, (২) মার্কণ্ডেয়, (৩) ভাগবত, (৪) ভবিষ্য, (৫) বিষ্ণু, (৬) বায়ু অথবা শিব, (৭) বরাহ, (৮) বামন, (৯) ব্রহ্ম, (১০) ব্রহ্মাণ্ড, (১১) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১২) অগ্নি, (১৩) নারদ, (১৪) পদ্ম, (১৫) লিঙ্গ, (১৬) গরুড়, (১৭) কূর্ম ও (১৮) স্কন্দ।

উপপুরাণগুলির সংখ্যাও অষ্টাদশ বলে কথিত। রঘুনন্দনের মতে এদের নাম—(১) সনৎকুমার, (২) নরসিংহ, (৩) বায়ু, (৪) শিবধর্ম, (৫) আশ্চর্য, (৬) নারদ, (৭) নন্দিকেশ্বর, (৮) উশনস্, (৯) কপিল, (১০) বরুণ, (১১) শাম্ব, (১২) কালিকা, (১৩) মহেশ্বর, (১৪) কল্কি, (১৫) দেবী, (১৬) পরাশর, (১৭) মরীচি এবং (১৮) ভাস্কর বা সূর্য।

মৎস্যপুরাণে আবার মহাপুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজস, তামস ও সঙ্কীর্ণ এই চারশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ

সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।

তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে।"

অর্থাৎ হরি বা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যে পুরাণগুলিতে অধিকরূপে কীর্তিত হয়েছে সেগুলি সাত্ত্বিক পুরাণ। যেমন—ভাগবত, নারদ বা নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ও বিষ্ণুপুরাণ। এগুলি বৈষ্ণব পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। যে পুরাণগুলিতে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকরূপে কীর্তিত দেখা যায় সেগুলি রাজস শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য এবং বামনপুরাণ। শিবের প্রাধান্য যে সকল পুরাণে স্বীকৃত হয়েছে সেগুলিকে তামস বা শৈব পুরাণ বলা হয়। যেমন—শিব বা বায়ু, লিঙ্গ, অগ্নি, স্কন্দ, মৎস্য ও কূর্মপুরাণ। সরস্বতী দেবীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্যখ্যাপক পুরাণগুলি সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র। পদ্মপুরাণে উক্ত নামগুলি উপরে বর্ণিতরূপে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। স্কন্দপুরাণের মতে মহাপুরাণগুলির ১০টিতে শিবের, ৪টিতে বিষ্ণুর, ২টিতে ব্রহ্মার, ১টিতে অগ্নির এবং ১টিতে সবিতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

মহাপুরাণগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে, মহাপুরাণের সংখ্যা চার। অনেক পণ্ডিতের মতে আবার প্রথমে একটিই পুরাণ ছিল এবং তা থেকে অপর পুরাণগুলির উদ্ভব ঘটেছে। হ্বিন্‌তারনিৎস্ সাহেব এই মত সমর্থন করেন নি। উপপুরাণগুলির সংখ্যা অষ্টাদশ অপেক্ষা বেশি। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"অন্যাশ্চ সংহিতাঃ সর্বা মারীচকাপিলাদয়ঃ।
সর্বত্র ধর্মকথনে তুল্যসামর্থ্যমুচ্যতে।।"

পুরাণসাহিত্যের রচনাকাল ঃ পুরাণসমূহ বেদভিত্তিক এবং এই জাতীয় গ্রন্থের রচনা বহু প্রাচীনকালে থেকেই প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ সাহিত্যে 'পুরাণ' কথাটি পাওয়া যায়। অবশ্য সে যুগে 'পুরাণ' জাতীয় সাহিত্য ছিল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কল্পসূত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্মসূত্রে পুরাণসাহিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। গৌতম ধর্মসূত্রে রাজাকে পুরাণের বিধি অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পুরাণের কয়েকটি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। অবশ্য এই শ্লোকগুলি বর্তমানে প্রচলিত কোন পুরাণে পাওয়া না গেলেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়। উক্ত ধর্মসূত্র দুটি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের। সুতরাং, ঐ সময়ে পুরাণসাহিত্য যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের কিছু পূর্বেও পুরাণসাহিত্য প্রচলিত ছিল। উক্ত উদ্ধৃতি থেকে আরও অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে যে মূল পুরাণ থেকে উক্ত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে প্রচলিত পুরাণসমূহ সেগুলির উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। এই অনুমান মহাপুরাণ ও উপপুরাণ উভয় শ্রেণী সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, গরুড় ও অগ্নিপুরাণ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক হাজরার মতে বর্তমান ব্রহ্মপুরাণটি অন্ততঃ দশম খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয়নি। এতদিন ধারণা ছিল যে, বর্তমান অগ্নিপুরাণটি মূল আগ্নেয় পুরাণ লুপ্ত হয়ে গেলে তার ভিত্তিতে বিরচিত হয়। কিন্তু কিছুকাল আগে বহ্নিপুরাণ নামে মূল আগ্নেয় পুরাণটি আবিষ্কৃত হয়েছে। উপপুরাণগুলির মধ্যে মূল কালিকাপুরাণ, আদিপুরাণ ও সৌরপুরাণ নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে ঐ নামে প্রচলিত

উপপুরাণগুলি অনেক পরবর্তীকালের রচনা। মহাভারত নিজেকে পুরাণ আখ্যা দিয়েছে এবং এর শুরুও পুরাণের ন্যায়। মহাভারতে অনেক আখ্যানও 'পুরাণে এরূপ উক্ত হয়েছে' বলে আরম্ভ হয়েছে। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে এমন অনেক অংশ আছে যা বায়ুপুরাণের অনেক অংশের সাথে হুবহু মিলে যায়। মহাভারতের একস্থানে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল কারণে হ্বিন্‌তারনিৎস্ সাহেবের মতে মহাভারত চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করবার বহু পূর্ব থেকেই পুরাণসাহিত্য প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলির অনেক অংশ মহাভারত অপেক্ষাও প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "From all this it appears that Puranas, as a species of literature, existed long before the final reduction of the Mahabharata and that even in the Puranas which have come down to us there is much that is older than our present Mahabharata."

রামায়ণের শেষভাগের রচনাশৈলীও পুরাণের অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত কিছু কিছু বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থের সাথে কোন কোন পুরাণের এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে, ঐ পুরাণগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বিরচিত বলেই মনে হয়। অনেকগুলি পুরাণে কলিযুগের রাজা ও রাজবংশ হিসাবে বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজার নাম এবং শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র, গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজবংশের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তার পরবর্তী হর্ষবর্ধন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজার বা কোন পরবর্তীকালের রাজবংশের নাম কোন পুরাণেই পাওয়া যায় না। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণি অষ্টাদশ পুরাণের নাম জানতেন। নবম শতকের দার্শনিক আচার্য শঙ্কর পুরাণের সাথে পরিচিত ছিলেন। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দার্শনিক আচার্য কুমারিল পুরাণসমূহকে ধর্মের প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক বাণভট্টও পুরাণ সাহিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন। এই সকল কারণে অনুমান করা যায় যে, বর্তমান রামায়ণ মহাভারতের রচনার পূর্ব থেকেই পুরাণসাহিত্যের রচনা আরম্ভ হয়েছিল এবং বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যেও অধিকাংশের রচনা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকেই পুরাণ সাহিত্যের রচনা শুরু হয়েছিল বলে Kaegi মহোদয় যে মত প্রকাশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত কোন কোন পুরাণ এবং কোন কোন পুরাণের কিছু অংশ অনেক পরবর্তীকালের রচনা। যেমন ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কোনারকের মন্দিরের উল্লেখ বর্তমান ব্রহ্মপুরাণের যে অংশে দেখা যায় তা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেরও পরের রচনা। ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস সংরক্ষক সূতজাতিই প্রথমে পুরাণসমূহের বক্তা ছিলেন। পরে অল্পশিক্ষিত পুরোহিত শ্রেণীর হাতে পড়ে পুরাণে নানা ধর্মীয় বিষয় সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ের রচনা। অনেক পুরাণে আবার এরূপ বর্ণনা আছে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রথমে পুরাণের ও পরে বেদসমূহের আবির্ভাব হয়। যেমন মৎস্যপুরাণে আছে ঃ

"পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ।।"

এই দৈবী উৎপত্তির মত অনুসারে পুরাণসমূহের কোন রচনাকাল নির্ণয় করবার প্রশ্নই ওঠে না। মৎস্যপুরাণেই আবার বলা হয়েছে যে, প্রথমে একটিই বিপুলায়তন পুরাণ ছিল এবং দ্বাপরে আবির্ভূত সত্যবতীর পুত্র অষ্টাবিংশ ব্যাস তাকে বিভক্ত করেন। এতে প্রকারান্তরে ব্যাসদেবকেই পুরাণসমূহের রচয়িতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল অনেক পরবর্তী যুগে এবং সে কারণে বৈষ্ণব ও শৈব পুরাণগুলিও অনেক অর্বাচীন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব যুগে এমন কি সম্ভবতঃ বুদ্ধ-পূর্ব যুগেই অনেক শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল। সুতরাং উক্ত পুরাণগুলিকে অতিশয় অর্বাচীন মনে করা সঙ্গত নয়।

পুরাণসাহিত্যের মূল্য ঃ ভারতীয় সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে নানাদিক দিয়ে পুরাণসাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের এবং ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ভাগের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পুরাণসাহিত্য থেকে পাই।

(১) রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পুরাণগুলির মূল্য অপরিসীম। ভবিষ্যদ্বাণীর ছলে পুরাণগুলি ভারতের এক সুদীর্ঘ যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে। পুরাণ নামটির তাৎপর্য রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই এগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলির রচনা যখন হয়েছে তার বহুশতাব্দী পূর্বেকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার সময় রচনাকার হয়তো অনেক কথা বিস্মৃত হয়ে গেছেন এবং অনেক ঘটনা হয়তো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। ফলে পুরাণসাহিত্য থেকে ইতিহাস উদ্ধার করা সুকঠিন। পূর্বে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পুরাণসমূহে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করতেন না। পার্জিটার সাহেবই প্রথম পুরাণগুলির অপরিসীম ঐতিহাসিক মূল্যের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করেন। পুরাণসমূহের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন সূত জাতি। এঁদের বিশেষ কাজ ছিল দেবতা, ঋষি, রাজা এবং মহান ব্যক্তিবর্গের বংশাবলী ও কর্ম সম্বন্ধে যথার্থ বিবরণ সংরক্ষণ করা। এই বিবরণগুলিই পুরাণের প্রথম উপাদান। বিচক্ষণ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের একনিষ্ঠ সতর্ক অনুসন্ধানে এসকল কাহিনী থেকে প্রাচীন ভারতের যত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাবে তত কথা অন্য কোথা থেকেও জানা যাবে না। প্রাচীন ভারতের রাজশক্তির কার্যাবলী ও বিভিন্ন রাজবংশের উত্থানপতন সম্পর্কে তথ্যাবলী লাভ করবার প্রধান উপাদান এই পুরাণসাহিত্য। সন্দেহ নেই, প্রাচীনতম পুরাণগুলি লুপ্ত না হলে উক্ত উপাদানরাজি সংগ্রহ করবার অনেক সুবিধা হত। তথাপি বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলির অনেক তথ্য বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণের দ্বারা সমর্থিত হয়। ঋগ্বেদ ও পুরাণের প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে কিছু অমিল থাকলেও তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং পুরাণসাহিত্যে প্রাচীন রাজবংশসমূহের যে ইতিহাস সংরক্ষিত আছে তার অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক সত্যতা অনস্বীকার্য। প্রাচীনকাল থেকে পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস জানবার একমাত্র অবলম্বন পুরাণসাহিত্য। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সময়টি নির্ণয় করতে পারলে তৎপূর্ববর্তী কালের অনেক রাজার এবং অনেক ক্ষুদ্রবৃহৎ ঘটনার কাল বৈদিক ও পুরাণসাহিত্যের সাহায্যে নির্ণয় করা সহজসাধ্য হত। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি (Aihole inscription) থেকে জানা যায় যে, উক্ত যুদ্ধের

কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০২ অব্দ এবং জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের মতে ঐ সময় থেকেই কলিযুগ শুরু হয়। পার্জিটার সাহেবের মতে উক্ত ভারতযুদ্ধের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৯৫০ অব্দ। অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত অবশ্য খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দকে ভারতযুদ্ধের কাল হিসাবে গ্রহণ করে মনু প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাল নির্ণয় করতে গিয়ে নিম্নরূপ অনুমান করেছেন ঃ

মনু	—	খ্রীষ্টপূর্ব	৩১০০ অব্দ।
যযাতি	—	,,	৩০০০—২৭৫০ অব্দ
মান্ধাতা	—	,,	২৭৫০—২৫৫০ অব্দ
পরশুরাম	—	,,	২৫৫০—২৩৫০ অব্দ
শ্রীরামচন্দ্র	—	,,	২৩৫০—১৯৫০ অব্দ
শ্রীকৃষ্ণ	—	,,	১৯৫০—১৪০০ অব্দ

শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, অন্ধ্র, শুঙ্গ, গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজবংশের বর্ণনা পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকেই অবশ্য আমরা ঐতিহাসিক অনেক তথ্য লাভ করেছি। সে সকল তথ্যের সঙ্গে পুরাণগুলির বর্ণনার অনেকাংশেই মিল আছে। স্মিথ (Smith) সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণে মৌর্যবংশের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫—১৮৫), মৎস্যপুরাণে অন্ধ্রবংশের, বায়ুপুরাণে গুপ্তবংশের (বিশেষত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের) প্রায় যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। আভীর, গর্দভ, শক, যবন, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির ভারত আক্রমণের বর্ণনা পুরাণসাহিত্যে প্রায় যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনা পুরাণগুলির বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।

(২) সামাজিক ইতিহাস ঃ ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষতঃ ধর্মের ইতিহাস জানতে হলে পুরাণগুলি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে হ্বিন্‌তারনিৎস্ সাহেব বলেছেন ঃ "They afford us far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its theism and pantheism, its love of God, its philosophy and its superstitions, its festivals and ceremonies and its ethics than any other works."

যুগে যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় হিন্দুজাতি কিভাবে কাজ করেছে, জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবিলা করেছে এবং এসকল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কিভাবে নতুন জাতীয় সত্তার অভ্যুদয় ঘটেছে তার ইতিহাস জানবার পক্ষেও পুরাণসাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাজরা তাঁর '*Our Heritage*' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "Like a living organism it has undergone changes from time to time with the changes in the social and religious life of the people and has thus been able to preserve to an appreciable degree materials for the study of popular life in ancient and mediaeval India." আধুনিক হিন্দুধর্মের যে পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত তার উৎস ও বিকাশ আমরা পুরাণেই দেখতে পাই। পুরাণ সাহিত্যেই আমরা প্রথম অবৈদিক হিন্দু পূজা পদ্ধতির সাক্ষাৎ পাই। বৈদিকযুগে যজ্ঞবেদীতে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত এবং তাঁদের স্তবস্তুতি করা হত। কিন্তু যজ্ঞপদ্ধতি ক্রমে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও আয়াসসাধ্য

হয়ে পড়ে বলে যজ্ঞ সম্পাদনের ক্ষমতা সকলের ছিল না। তা ছাড়া, ঐ সকল যাগযজ্ঞে ও বৈদিক সাহিত্যে সর্বসাধারণের অধিকারও ছিল না। ফলে, বৈদিক ধর্ম বা বৈদিক সাহিত্য সর্বসাধারণের বা জনগণের ধর্ম বা সাহিত্য ছিল না। সে কারণে বেদের উপর ভিত্তি করে এবং যুগের প্রয়োজনে বৈদিক ধর্ম ও সাহিত্যের সংস্কারসাধন করে পুরাণসমূহ এক সর্বজনীন ধর্মের প্রচলন করে এবং বৈদিক সাহিত্যকেও সর্বজনের বোধগম্যরূপে প্রচার করে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করে। বৈদিক হিন্দুর ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাধারণীকরণ পুরাণ সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অবদান। অবশ্য বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্মের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য দেখা যায়। পুরাণে বৈদিক যজ্ঞের স্থানে দেখা দিয়েছে 'দান'। ভাগবত সম্প্রদায় কঠোরভাবে যজ্ঞধর্মের সমালোচনা করেছেন এবং যজ্ঞে পশুহত্যার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নি। এ সময়েই ধর্মের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নীতিরূপে অহিংসার আবির্ভাব হয়েছে দেখা যায়। জৈন, বৌদ্ধ ও ভাগবত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে এবং সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসও পুরাণসমূহ থেকেই জানা যায়। এ সময়ের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার একটি বিশেষ চিত্র ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৬৪তম অধ্যায়ে দেখা যায়। পুরাণেই আমরা সর্বপ্রথম নানা মূর্তি, দেবমন্দির, তীর্থস্থান, ব্রত প্রভৃতির বর্ণনা পাই। এই যুগেই সর্বসাধারণের মিলনস্থানরূপে দেবমন্দিরের সৃষ্টি। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার পরিবর্তে পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাধা-কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা প্রভৃতি নতুন দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। মন্দিরে মন্দিরে এই সকল নতুন দেবদেবীর পাষাণময়ী অথবা ধাতুময়ী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এঁদের নতুন রূপকল্পনা, পূজাপদ্ধতি, মন্ত্রস্তুতি সকল কিছুই পাওয়া যায় পুরাণসাহিত্যে। হিন্দুধর্মের ধর্মানুষ্ঠানের নানা আচার-পদ্ধতির যৌক্তিকতা নির্ধারণের জন্য পুরাণসাহিত্যের নানা আখ্যান-উপাখ্যানের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। অনার্য এবং অবৈদিক আর্য উপাসনা পদ্ধতিও পুরাণে স্থান লাভ করেছে। অনার্যগণের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে আর্য হিন্দুধর্মে তাদের পূজাপদ্ধতিরও অনুপ্রবেশ কীভাবে ঘটেছে তাও পুরাণসাহিত্য পাঠেই অনুধাবন করা যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তিবাদ এবং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ও বিকাশের ইতিহাসও পুরাণসাহিত্যে নিবদ্ধ। পুরাণগুলি একটি নতুন যুগের সূচক। এ যুগেই বিভিন্ন দেবতার পৃথক পৃথক পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল এবং এক এক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের উপাস্য দেবতা অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেই কীর্তিত হত। সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত—অন্ততঃ এই তিনটি দার্শনিক ধারার বর্ণনা আমরা পুরাণসাহিত্যে পাই। কৃষ্ণ, শ্বেত, তাম্র ও পীত—এই চতুর্বর্ণের জনগণকে নিয়ে গঠিত এক হিন্দু সমাজের বর্ণনাও পুরাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

(৩) ভৌগোলিক তথ্য ঃ পুরাণসাহিত্যেই আমরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের একটি ভৌগোলিক ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখতে পাই। এই সাহিত্যে সে যুগের অনেক ভৌগৌলিক তথ্যও নিবদ্ধ আছে।

(৪) সাহিত্যিক মূল্য ঃ সাহিত্যিক বিচারে পুরাণসাহিত্যের বিশেষ কোন মূল্য নেই। কেবলমাত্র সাহিত্যরসপিপাসা নিয়ে পুরাণগুলি পাঠ করা একরূপ অসম্ভব। এই সাহিত্যের মাহাত্ম্য অংশগুলি সর্বাপেক্ষা অপাঠ্য। তবে ভারতীয় সাহিত্যের অনেক গ্রন্থের কাহিনীর উৎস সন্ধানে এই পুরাণসাহিত্যেই যেতে হয়। পুরাণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে উত্তরকালে যে সাহিত্যসম্ভার গড়ে উঠেছে সেগুলির মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে বিরচিত সাহিত্যই প্রধান।

পুরাণের প্রভাব ঃ ভারতীয় জনজীবনে পুরাণসমূহের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এই সাহিত্য এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং লোকশিক্ষার মুখ্য বাহন ছিল। পুরাণের সংখ্যার এবং সারা ভারতে এই সাহিত্যের অসংখ্য হাতেলেখা পুঁথি এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। ভারতীয় হিন্দুধর্ম মূলতঃ পুরাণভিত্তিক অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের পূজা-অর্চনা, ব্রতনিয়ম সকল কিছুই মূলতঃ পুরাণ নিয়ন্ত্রিত। পুরাণই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। এখনও বিভিন্ন ধর্মস্থানে নিয়মিত পুরাণ পাঠ করা হয়ে থাকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য নিয়ে 'চণ্ডী' নামক অংশটি এবং ভাগবতপুরাণ বহুলভাবে পঠিত হয়। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পূজা 'দুর্গাপূজা'ও পুরাণভিত্তিক। বস্তুতপক্ষে আমাদের সকল পূজাপার্বণই পুরাণভিত্তিক। ধর্মই ভারতীয় জীবনের ধারকবাহক ও ভিত্তিভূমি। সেই ধর্মের উপর পুরাণের অখণ্ড অপ্রতিহত প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে পুরাণের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পুরাণ-পাঠ, শ্রবণ, নকল ও দান এখনও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সাহিত্যেও পুরাণসমূহের প্রভাব অপরিসীম। পুরাণসাহিত্যের নানা আখ্যান-উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে বহু কবি তাঁদের কাব্য-নাটক রচনা করেছেন। উত্তর-কালের সাহিত্যের মধ্যে প্রায় কোনটাই পুরাণের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। পুরাণের পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকটি রচিত বলে অনেকে মনে করেন। কারও কারও মতে পদ্মপুরাণের শকুন্তলা উপাখ্যানই কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কাহিনীর উৎস। অবশ্য এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। পরবর্তীকালে পুরাণের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নানা কাব্য রচিত হয়েছে। এই সকল কাব্যের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে বিরচিত কাব্যসমূহই প্রধান।

কয়েকটি পুরাণের আলোচনা

(১) ব্রহ্মপুরাণ ঃ অষ্টাদশ মহাপুরাণের নামের বিভিন্ন তালিকায় প্রথমেই দেখা যায় ব্রহ্মপুরাণের নাম। এতে ব্রহ্মার প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে বলে এটা রাজস-শ্রেণীর অন্তর্গত। নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিবৃন্দের অনুরোধে সূত লোমহর্ষণ যে সৃষ্টিক্রম বর্ণনা করেন তাই এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু। বিশ্বের, দেবগণের, চন্দ্রবংশীয় ও সূর্যবংশীয় রাজগণের উৎপত্তি এবং মানবজাতির আদিপুরুষ মনু ও তাঁর বংশধরদের উৎপত্তি, পৃথিবীর আকৃতি ও বিভাগ, স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা ইত্যাদি এই পুরাণের বিষয়বস্তু। এর অনেক অংশে আছে নানা তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা, সূর্যের উপাসনা ও আদিত্যগণের উৎপত্তি বর্ণনা, পার্বতীর জন্ম ও শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহের বর্ণনা এবং শিবের নানা কাহিনী। এর কিছু অংশে কৃষ্ণের জীবনকাহিনী এবং শেষভাগে বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প, নীতি, স্বর্গসুখ ও নরকদুঃখের বর্ণনা আছে। এতে ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কোনারকের সূর্যমন্দিরের বর্ণনা থাকায় প্রমাণিত হয় যে, এর কিছু অংশ ত্রয়োদশ শতকেরও পরে রচিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে ব্রহ্মপুরাণ পাই তা বেশ অর্বাচীন কালের রচনা বলেই মনে হয়।

(২) বিষ্ণুপুরাণ ঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ হল বিষ্ণুপুরাণ। এতে পুরাণের সর্গ, প্রতিসর্গ ইত্যাদি পঞ্চলক্ষণরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান। এতে বর্ণিত বিষয়সমূহের একটা ধারাবাহিকতা আছে ; অন্যান্য পুরাণের মত এটা কতকগুলি বিক্ষিপ্ত আলোচনার সঙ্কলন নয়।

এই সকল কারণে হ্বিন্‌তারনিৎস্ সাহেবের মতে সম্ভবতঃ এই পুরাণখানির প্রাচীন মূলরূপ এখনও বজায় আছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"....We are here dealing with a work of the earlier Purana literature, which, on the whole at least, has been preserved in its original form." দার্শনিকপ্রবর রামানুজাচার্য তাঁর বেদান্তসূত্রের বিখ্যাত টীকায় এই পুরাণটিকে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এই গ্রন্থে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের অথবা কোন বিষ্ণুমন্দিরের উল্লেখ নেই। স্মিথ সাহেবের মতে মৌর্য রাজবংশের ইতিহাস জানবার পক্ষে এটা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(৩) মৎস্যপুরাণ ঃ এটা পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব বা সাত্ত্বিক শ্রেণীর পুরাণ। সম্ভবতঃ শতপথব্রাহ্মণের মনু-মৎস্যকথা এর কাহিনীর উৎস। প্রবল বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হলে মৎস্যরূপী বিষ্ণুকর্তৃক নৌকারূঢ় মনুর উদ্ধারের কাহিনী এতে মনু-মৎস্যের কথোপকথনচ্ছলে বিধৃত। এর একস্থানে জৈনধর্মের ও অবৈদিক ধর্মসমূহের উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে, এর কিছু অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত। স্মিথ সাহেবের মতে অন্ধ্র রাজবংশের ঐতিহাসিক নানা তথ্য এই গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ আছে।

(৪) বায়ুপুরাণ ঃ প্রাচীন পুরাণের পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত এই গ্রন্থে শিবের উপাসনার বহুল আলোচনা আছে। এই কারণে এটা শিবপুরাণ বা শৈবপুরাণ নামেও পরিচিত। মহাভারতে এবং হরিবংশে একখানি বায়ুপুরাণের উল্লেখ আছে। তার অনেক অংশের সঙ্গে বর্তমান বায়ুপুরাণের মূল ভাগের কিছু অংশের আক্ষরিক মিল দেখা যায়। মহাকবি বাণভট্ট বায়ুপুরাণ শ্রবণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের গুপ্তরাজবংশের অনেক তথ্য এই পুরাণে পাওয়া যায়। হ্বিন্‌তারনিৎস্ সাহেবের মতে বর্তমান বায়ুপুরাণখানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বিরচিত।

(৫) ভাগবতপুরাণ ঃ ভারতবর্ষে পুরাণসাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ভাগবতপুরাণকে সশ্রদ্ধভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলা হয়। এটি দ্বাদশ স্কন্ধে প্রায় ১৮০০০ শ্লোকে বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী, লীলা, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা, কলিযুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি এর বিষয়বস্তু। বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের ভাগবত শাখার কাছে গ্রন্থখানি পরম শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রামাণ্য। অনেকের নিকট এটি নিত্যপাঠ্য। এর দশম স্কন্ধটি বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অত্যন্ত প্রিয়। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য এটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এর উপর বহু টীকা রচিত হয়েছে। প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার জন্য পুরাণসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ভাগবতপুরাণেরই ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হয়। বিষ্ণুপুরাণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর বিষয়বস্তুর বহু মিল থাকলেও এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের রচনা। এই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত মুক্তাফল গ্রন্থের এবং এর অনুক্রমণীর রচয়িতা বোপদেবকেই এই পুরাণের রচয়িতা বলে অনেকে মনে করেন এবং ফলে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতককে এর রচনাকাল মনে করেন। C. V. Vaidya মহোদয়ের মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শঙ্করাচার্য এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবের মধ্যবর্তী কোন সময়ে এটা বিরচিত। পার্জিটার সাহেবের মতে গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় নবম শতক। হ্বিন্‌তারনিৎস্ সাহেবের মতে এটা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত হয়েছিল। আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতায়, কাব্যোৎকর্ষে, ভাষা-ছন্দ-রীতির সৌন্দর্যে ও ছন্দোব্যবহারের পরিপাট্যে ভাগবতপুরাণ পুরাণসাহিত্যের মধ্যে অগ্রগণ্য।